রকিবুল হাসান

কল্যাণী ২.০

কল্যাণী ২.০

কল্যাণী ২.০

(২০০১-২০১৭)

রকিবুল হাসান

আদর্শ

প্রকাশক: আদর্শ
অফিস: ২০ বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা ১২০৫
সেলস: ৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
(+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০
Email: hello@adarsha.com.bd
Facebook Page: facebook.com/myAdarsha

কল্যাণী ২.০
১ম প্রকাশ: ২৩ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ; ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

© রকিবুল হাসান
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স

অনলাইনে আদর্শ'র বই
www.adarsha.com.bd
www.rokomari.com/adarsha

Kalyani 2.0 (Published in Bengali)
by *Rakibul Hassan*
Published by Adarsha
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100

ISBN: 978-984-99909-0-1

উৎসর্গ

আনাসের জন্য।

আনাস, তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে প্রযুক্তিবিদ হওয়ার, এমন কিছু বানানোর যা মানুষের জীবন বদলে দেবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় স্বপ্ন ছিল তোমার— দেশকে ভালোবাসার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর।

মিছিলে যাওয়ার আগে মা'র জন্য ফেলে যাওয়া চিঠিটা এখন শুধু একটা লেখা নয়, একটুকরো আগুন। তুমি লিখেছিলে,

'তোমার কথা অমান্য করে বের হলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাইয়েরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধী কিশোর, ৭ বছরের বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেন বসে থাকব ঘরে। একদিন তো মরতেই হবে। তাই মৃত্যুর ভয় করে স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়, সে-ই প্রকৃত মানুষ।'

তুমি জানতেই, হয়তো আর ফিরতে পারবে না। তবু থামোনি।

তুমি নেই, কিন্তু তোমার সাহস রয়ে গেছে। তোমার পদচিহ্ন ধরে একদিন হয়তো কেউ হাঁটবে; তোমার স্বপ্ন কেউ এগিয়ে নেবে। তুমি হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারোনি, কিন্তু তুমি গড়ে গিয়েছ সাহসের এক স্থায়ী ভিত্তি, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের কারণেই বাংলাদেশ আর হারাবে না পথ।

এটা একটা হাইটেক সাইকোলজিক্যাল কিশোর উপন্যাস। এখানে বর্ণিত প্রযুক্তি পৃথিবীতে বর্তমান। তবে এই গল্পে ব্যবহৃত সমস্ত স্থান, চরিত্র ও কাহিনী কাল্পনিক, মস্তিষ্কপ্রসূত। কারো চরিত্র কিংবা কোনো ঘটনার সাথে মিলে গেলে তা কাকতালীয় ঘটনা মাত্র। এর জন্য লেখক দায়ী নন।

আজকের দিন

সেপ্টেম্বরের সকাল। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে। উপরের দিকে তাকালেন জহির সাহেব। এয়ারকন্ডিশনার চলছে ২৪ ডিগ্রিতে। ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমে সিলিং ফ্যানটাও ঘুরছে আস্তে আস্তে। গায়ে হালকা বাতাস লাগলে ভালো লাগে বলে ফ্যানটা চালানো। স্টাইলিশ ফ্যান। শুধুমাত্র বাতাসের জন্য নয়। জহির সাহেব বসে আছেন একটু ঝুঁকে। হঠাৎ করেই টপ করে একটা ঘামের ফোঁটা পড়ল হাতে।

উনি অবাক হয়ে তাকালেন হাতের দিকে। হাতটাও কাঁপছে। এত ঠাণ্ডায় ঘাম পড়ার কথা নয়। কিন্তু তাঁর সারা শরীরে কেমন যেন জ্বর জ্বর করছে। ড্রয়িংরুমে ফিনাইলের গন্ধ থাকার কথা না। মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা মোবাইল মেসেজ তাঁর সমস্ত শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

জহির সাহেব বিপত্নীক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একাই মানুষ করেছেন শাদাবকে। ছেলে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। হঠাৎ আজ সকালে পাওয়া সেই মেসেজ ভীষণভাবে বিচলিত করে তুলেছে তাঁকে।

তিনি আবার মোবাইলটা হাতে তুলে নিলেন। সমস্যা হচ্ছে, মেসেজটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে। একটু আগে বন্ধু রফিককে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন ব্যাপারটা। রফিক বলল, “এটা হয়তো মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমের কোনো সিস্টেম মেসেজ হতে পারে।” কিন্তু জহির সাহেব এসব প্রযুক্তির ততটা ধার ধারেন না। তবে তিনি অনুভব করছেন, এটা কোনো সাধারণ মেসেজ নয়। রফিক বলছিল মেসেজটা হয়তোবা ক্যারিয়ার হয়ে আসেনি। ওই মোবাইল কোম্পানিতেই চাকরি করে রফিক। রফিককেও উদ্বিগ্ন মনে হলো।

বারবার তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে শাদাবের ঘরের দরজার দিকে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করা। ভেতর থেকে ভেসে আসছে মিস্টার মিস্টারের একটা গানের সুর। ব্রোকেন উইংস। গানটার নামটা কখনোই মনে থাকে না তার। আজ সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল। জহির সাহেব নিজেও অনেক গান শোনেন। তাঁর

পুরোনো ভাইনল রেকর্ডের সংগ্রহ বিশাল। কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই এখন শাদাবের ঘরে। ছেলের সংগীতরুচি দেখে তার ভালো লাগে, কিন্তু একই সঙ্গে একটু উদ্বিগ্নও। ও ৮০'র দশকের গান শুনবে কেন? শুনবে জমানার ট্র্যাভিস স্কট। নিজের ব্যস্ততার কারণে আজকাল তেমন সময় পান না গান শোনার। রুমে একটা সোনোস মিউজিক স্ট্রিমার এখন তাঁর সঙ্গী।

শাদাব তার মাকে মনে করতে পারে না। আড়াই বছরে মা চলে গেছেন 'বেবি' রিলেটেড কমপ্লিকেশনে। তবে মায়ের একটা বড় ছবি আছে তার ঘরে—যেখানে মা তাকে কোলে নিয়ে হাসছেন। তাকে এমনভাবে ধরে আছেন যে, মনে হচ্ছে কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। শাদাবের জীবনে মায়ের অনুপস্থিতি অনেকটাই পূরণ করেছেন তার নানু। প্রতিদিন শাদাবের খোঁজ না নিলে ঘুম হয় না নানুর। ছোটবেলায় স্কুল ছুটির দিনগুলোতে বাবার ভাইনল রেকর্ডগুলো ছিল শাদাবের প্রিয় সঙ্গী।

জহির সাহেব আবার চেষ্টা করলেন মেসেজটা রিকল করার। মেসেজটা খুঁজে না পেলেও জিনিসটা যেন তাঁর মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। আবার মনে করলেন। মুখস্থ হয়ে গেছে সেটা। মেসেজটা কিছুটা এ রকম ছিল:

"আমরা ধারণা করছি, শাদাব একটা মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে ৫০ থেকে ৬০ দিনের টাইমলাইনে শাদাবের আত্মহত্যার সম্ভাবনা দেখছি। এটা এড়ানো সম্ভব। এই মাসের ১৩ তারিখে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করা আছে, তারা আপনাকে ফলোআপ করবে। তাকে চোখে চোখে রাখুন।

— কল্যাণী"

মেসেজটি পড়ে জহির সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। তাঁর একমাত্র সন্তান—শাদাব কীভাবে এমন অবস্থায় পৌঁছাল? তিনি কি কোথাও ভুল করেছেন? শাদাবকে কি তিনি যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি?

জহির সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন শাদাবের ঘরের দিকে। দরজায় আলতো করে নক করলেন। "শাদাব, বাবা? আসবো?" ভেতর থেকে শাদাবের গলা ভেসে এলো, "আসো বাবা।"

জহির সাহেব ঘরে ঢুকলেন। শাদাব বিছানায় বসে ল্যাপটপে কিছু একটা করছিল। বাবাকে দেখে সে ল্যাপটপটা একটু সরিয়ে রাখল।

"কী করছিস?" জহির সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

শাদাব একটু হেসে বলল, “কিছু না বাবা। একটা মডেল ট্রেনিং দেখছিলাম।”

জহির সাহেব ছেলের পাশে বসলেন। শাদাবের চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। কথা ঘুরালেন ইচ্ছে করেই। “তোর মা’র কথা মনে পড়ে?”

শাদাব একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, “হ্যাঁ, মাঝে মাঝে। তবে মা’র হাসি মনে পড়ে বেশি।”

জহির সাহেব অবাক হলেন। “মা’র হাসি?”

শাদাব মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ। নানু বলত, মা নাকি সারাদিন হাসতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন নানু আমাকে মা’র গল্প শোনাত। একবার নাকি আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তার বলেছিল, খুব সিরিয়াস। ফেরার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মা তখনো হাসছিলেন। বলছিলেন, ‘আমার শাদাব ঠিক হয়ে যাবে।’ আর সত্যিই তো, আমি সেরে উঠেছিলাম।” নানু বলত, মা নাকি কিছুটা পাগলাটে ছিল।

জহির সাহেবের চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি মনে করতে পারলেন সেই দিনটা। তাঁর স্ত্রী সত্যিই অদ্ভুত ছিলেন। সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তেও হাসি দিয়েই সবাইকে অভয় দিতেন। আবার, বাচ্চাকে বাটারফ্লাই দিয়ে রক্তের স্যাম্পল নিতে গিয়ে সিস্টারকেই মা’র কান্না থামাতে অস্থির থাকতে হতো। এগুলো মনে আছে “ভিভিডলি” জহির সাহেবের। প্রতিবার রক্তের স্যাম্পল নিতে জহির সাহেবের সাহায্য চাইত সব সিস্টার। বাচ্চা অন্ত মা।

শাদাব আবার বলল, “জানো বাবা, গতকাল একটা স্কুলের সামনে দিয়ে আসছিলাম। ছোট্ট একটা বাচ্চা ড্রেনে পড়ে গিয়েছিল। আমি ওকে তুলে দিলাম। ভ্যা ভ্যা কাঁদছিল শুরুতে। আমি ওকে বললাম, এই ‘কাঁদবে না একদম। দেখো, আমি হাসছি। তুমিও হাসো।’ আর ও সত্যিই হেসে ফেলল।”

জহির সাহেব ছেলের দিকে তাকালেন। শাদাবের হাসিতে তার মায়ের কিছুটা পাগলামি চোখে পড়ল। যেন তার মা’র হাসি ফুটে উঠেছে সেখানে। জহির সাহেব মনে মনে আরও ভয় পেলেন।

“তুই খুব ভালো করেছিস, বাবা।” জহির সাহেব বললেন। “তোর মা শুনলে খুব খুশি হতেন।”

শাদাব হঠাৎ করে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। “বাবা, আমি জানি তুমি খুব কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছ। আমাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করবে না।”

জহির সাহেব ছেলেকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মনে হলো, সেই অজানা মেসেজটা হয়তো ভুল ছিল। তাঁর ছেলে ঠিকই আছে। আর হাসির মধ্যে এই পাগলামি আছে সবারই মধ্যে। এ ছাড়া এই কল্যাণীটা কে? হ্যাকার নাকি?

রফিকের কাছে গেলেন জিনিসটা নিয়ে আলাপ করতে। মোবাইলটা নিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছে সে। শেষে রফিক তাকে ওই ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্টের জন্য ওয়েট করতে বলল। শাদাবকে চোখে চোখে রাখতে বলল সেও।

ওই দিন সন্ধ্যায় জহির সাহেব তাঁর পুরোনো ভাইনল রেকর্ডগুলো শাদাবের রুমে বের করলেন। কফি বানিয়ে আনলো শাদাব। বাবা-ছেলে মিলে কিছুক্ষণ গান শুনলেন। শাদাব বলল, "বাবা, ব্লেন্ডার কীভাবে 'উই বিল্ট দিস সিটি'-কে বাজে গান বলে? পাগল একটা!"

জহির সাহেব জোর করে হাসলেন। "কেন, আমার কাছে তো ভালোই লাগে। তবে, 'সারা' হচ্ছে বেস্ট।"

রাতে জহির সাহেব ঘুমোতে যাওয়ার আগে আবার মোবাইলটা চেক করলেন। জানেন যে, সেই রহস্যময় মেসেজটা আর খুঁজে পাবেন না। তবে, কীভাবে এপয়েন্টমেন্টটা সেট হবে সেটা নিয়ে ঘুম এলো না সারা রাত।

নভেম্বর, ২০০১

শাহরিয়ার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে শহরটা যেন জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু তার মনের ভেতর এক অন্যরকম আলোর ঝিলিক। মনে হলো, চোখের সামনে ভেসে উঠল অন্য এক দৃশ্য— ঢাকার ধূলিধূসর আকাশ, রিকশার ঘণ্টির শব্দ, রাস্তার ধারের ফুচকাওয়ালার হাঁক।

তার অ্যাপার্টমেন্টটা ম্যানহাটনের আপার ইস্ট সাইডে, ইস্ট ৮৬ স্ট্রিট আর ইস্ট এন্ড এভিনিউর সংযোগস্থলে। বারান্দা থেকে সে দেখতে পাচ্ছে, কার্ল শুর্জ পার্কের সবুজ গাছপালা, যেখানে সন্ধ্যায় কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে অনেকে। দূরে ইস্ট রিভারের পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে শহরের আলো।

শাহরিয়ার চোখ ফেরাল লেক্সিংটন এভিনিউর দিকে। রাস্তার দুপাশে সারি ধরে দোকানপাট, রেস্তোরাঁ আর কফি শপগুলোতে ভিড় জমেছে। মেট্রো

“এখন সেটা বাস্তবে রূপ নেবে,” রাশাদ শাহরিয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। “আমাদের কাছে এখন অ্যালগরিদম আছে, টেকনোলজি আছে। হিনটনের পেপার দেখলি তো? ডিপ লার্নিং দিয়ে আমরা এমন জিনিস করতে পারব, যা আগে কেউ ভাবতেও পারেনি।”

শাহরিয়ার ল্যাপটপ খুলে এক্সপেডিয়া থেকে ঢাকার ফ্লাইট সার্চ করতে লাগল। “সিঙ্গাপুর হয়ে যাব আমরা। ইকুইনিক্স ডেটা সেন্টারে একটা কাজ আছে।”

“বুক করে ফেল, ইকুইনিক্স এর হোস্টিং দেখে যেতে চাই।” রাশাদ বলল। তারপর একটু থেমে যোগ করল, “তোর মনে আছে ২০০১ সালে আমরা যখন প্রথম এই আইডিয়াটা নিয়ে কথা বলছিলাম? তখন শুধু একটা স্বপ্ন ছিল। আজ সেটা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।”

শাহরিয়ার টিকেট বুক করে ফেলল। “এবার আমরা দেখাব, টেকনোলজি শুধু বিজনেসের জন্য নয়। এটা দিয়ে একটা দেশকে বদলে দেওয়া যায়।”

সন্ধ্যা নামছে ম্যানহাটনে। টাইমস স্কোয়ারের বাকি স্ক্রিনগুলোতে একে একে আলো জ্বলছে। অফিসের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে হাডসন রিভারে সূর্যাস্তের আভা।

“রেডি?” রাশাদ জিজ্ঞেস করল।

“অলওয়েজ,” শাহরিয়ার বলল। “চল, ঘরে ফিরি।”

ডিসেম্বর ২০০৯

ঢাকার বুকে তখনো কুয়াশার পাতলা চাদর। সূর্য উঠেছে, কিন্তু তার আলো এখনো যেন লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে। রাজধানীর একেবারে বুকের মাঝখানে, স্থানীয় একটা হোটেল স্যুটের কনফারেন্স রুমে বসে আছে ব্রায়ান। তার পাশে হামিদ। মিটিংটা কিছুটা গোপনীয়। দুবাই থেকে উড়ে এসেছে ওরা, গত রাতেই। হামিদ দুবাই থেকে এশিয়ান অপারেশন চালায়।

ব্রায়ান তার ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে ফাইনাল ডেমোর জন্য তৈরি হচ্ছে। স্ক্রিনে চলছে জটিল অ্যালগরিদমের কিছু প্রজেকশন। ব্যাকএন্ডে বিশাল ৬টা ডেটাসেট প্রসেস হচ্ছে ঢাকার ৩টা ডেটা সেন্টারে। মাঝে মাঝে সিকুয়েল

কোয়েরি তৈরি করছে লাল-সবুজ রঙের কয়েকটা গ্রাফ। ব্রায়ান জানে, এই অদৃশ্য নাচের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।

হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল। সবার দৃষ্টি সেদিকে। মন্ত্রী ঢুকলেন। মাঝারি উচ্চতার এক ভদ্রলোক, পরনে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা। চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। বাইরের মিটিং উনি পছন্দ করেন না, তবে উপর থেকে বলা হয়েছে।

ব্রায়ান উঠে দাঁড়াল। "স্যার, আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এমন একটা বিশাল জয়— সত্যিই অসাধারণ!"

মন্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। "হ্যাঁ, জনগণ আমাদের পাশে আছে।"

ব্রায়ান এবার মূলকথায় এলো। "স্যার, আসলে আপনাদের এই অসাধারণ জয়ের পেছনে একটা বড় ভূমিকা ছিল আপনাদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ডেটাবেজের। আমাদের বিশ্লেষণে তা স্পষ্ট।"

মন্ত্রীর চোখ সরু হয়ে এলো। "কী বলতে চান আপনি? স্পষ্ট করে বলুন।"

ব্রায়ান তার ল্যাপটপ ঘোরাল। স্ক্রিনে নানা রঙের গ্রাফ, চার্ট। "দেখুন স্যার, এটা আমাদের 'এআই' সিস্টেম। এটা শুধু সাধারণ মেশিন লার্নিং নয়। এটা ডিপ লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের সমন্বয়। আমরা এতে ন্যুরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছি, যা মানুষের মস্তিষ্কের মতোই কাজ করে।"

মন্ত্রীর বিরক্তিভাব কমে আসছে। উনি এগিয়ে এলেন। "কীভাবে কাজ করে এটা?"

ব্রায়ান ব্যাখ্যা করতে লাগল। "প্রথমে, আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে ডেটা সংগ্রহ করি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার— এসব তো আছেই। কিন্তু আমরা আরও গভীরে যাই। ব্যাংক ট্রানজেকশন, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার, এমনকি মোবাইল ফোনের লোকেশন ডেটা— সবকিছু আমরা ট্র্যাক করি।"

"তারপর?"

"তারপর আমাদের 'এআই' এই সব ডেটা প্রসেস করে। এটা শুধু ডেটা অ্যানালাইসিস নয়, স্যার। আমাদের 'এআই' সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করে। কে কী ভাবছে, কার মনের গভীরে কী চলছে— সব বুঝতে পারে। এরপর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একটা করে সাইকোমেট্রিক প্রোফাইল তৈরি করে।"

ব্রায়ান বলেই চলল, “দেখুন, এই যে গ্রাফগুলো— এগুলো দেখাচ্ছে মানুষের বিহেভিয়্যারাল প্যাটার্ন। কে কোন ধরনের কনটেন্ট পছন্দ করে, কোন সময়ে অনলাইনে থাকে..., আর কারা একদম নেই। মানে ফিচার ফোন।”

মন্ত্রীর চোখে বিস্ময়। “এত কিছু!”

ব্রায়ান হাসল। “এটা তো শুরু মাত্র। এরপর শুরু হয় প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স। আমাদের ‘এআই’ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কে কখন কী করবে, কোন দলকে সমর্থন করবে— সব বলে দিতে পারে। এখন আমাদের কাজ হবে তার মনকে কীভাবে ঘুরিয়ে দেয়া যায় আপনাদের দিকে।”

“আর তারপর?”

“তারপর শুরু হয় মাইক্রোটার্গেটিং। প্রতিটা মানুষের জন্য একদম টার্গেটেড বার্তা। উনি ভাববেন, এটা সবাই দেখেছে। কেউ অর্থনীতি নিয়ে চিন্তিত? তার কাছে যাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের খবর। কারও কাছে শিক্ষা বড় ইস্যু? তার কাছে যাবে শিক্ষা খাতে উন্নয়নের তথ্য।”

মন্ত্রী এগিয়ে এলেন। “এতে লাভ কী?”

“স্যার, এই যে নীল রেখাটা দেখছেন— এটা তার মেন্টাল স্টেট শো করছে। সকালে যখন ফেসবুক খোলে, তখন তার মাইন্ড রিল্যাক্সড থাকে। সেই সময় যদি আমরা তার টাইমলাইনে একটা পজিটিভ নিউজ শো করি, সেটা তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটবে। এদিকে বিরোধী দলের ব্যাপারে একদম কাস্টম মেসেজ।”

হামিদ এবার ল্যাপটপে আরেকটা উইন্ডো খুলল। “আর এই দেখুন, এই সবুজ গ্রাফটা। এটা দেখাচ্ছে সে কী ধরনের কনটেন্ট বেশি পছন্দ করে। ফ্যামিলি ফটো, ট্র্যাভেল ভিডিও, কুকিং রেসিপি— এসব দেখে বেশি সময় কাটায়।”

“তার মানে?” মন্ত্রী জানতে চাইলেন।

ব্রায়ান ব্যাখ্যা করল, “এর মানে স্যার, তার মূল্যবোধ কী তা আমরা জানি। ফ্যামিলি ভ্যালু তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই যখন আমরা তার কাছে মেসেজ পাঠাব, সেখানে ফ্যামিলি থিম ব্যবহার করব। যেমন— ‘আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে’।”

মন্ত্রীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। “অসাধারণ! আর কী কী জানতে পারেন?”

“অনেক কিছু স্যার। এই যে বেগুনি লাইনটা— এটা দেখাচ্ছে তার ইমোশনাল স্টেট। কখন সে হ্যাপি থাকে, কখন স্ট্রেসড। যেমন, সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরার পর সে একটু ডিপ্রেসড থাকে। সেই সময় যদি তার ফেসবুক, ইউটিউব ফিডে একটা হাসির ভিডিও দেখাই, তার মুড ভালো হয়ে যায়।”

“আর এই কমলা রঙের গ্রাফটা,” হামিদ বলল, “এটা শো করছে তার ফাইন্যান্সিয়াল হ্যাবিট। মাসের শুরুতে বেশি শপিং করে, শেষের দিকে সেভিংস মোডে থাকে। এই ইনফরমেশন দিয়ে আমরা বুঝতে পারি কখন তার কাছে কোন ধরনের নিউজ পাঠাতে হবে। যেই নিউজ জেনে সে আর খরচ করতে চাইবে না।”

ব্রায়ানের গলায় একটা অদ্ভুত শুষ্কতা। “আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো স্যার, আমাদের ‘এআই’ শুধু একজনের নয়, পুরো দেশের মানুষের এই প্রোফাইল তৈরি করতে পারে। প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি।”

হুম।

ব্রায়ান পরের স্লাইডে গেল। “স্যার, এখন দেখি আমরা কীভাবে মানুষের পার্সোনালিটি অনুযায়ী মেসেজ তৈরি করি।”

স্ক্রিনে একটা নতুন চার্ট। মন্ত্রী আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এলেন।

“দেখুন, একজন মানুষ যদি ইন্ট্রোভার্ট হয়, তার জন্য আলাদা মেসেজ। যে এক্সট্রোভার্ট, তার জন্য আলাদা। যে খুব ইমোশনাল, তার জন্য আবার অন্যরকম।”

হামিদ একটা উদাহরণ দিল, “যেমন ধরেন, শিক্ষার বিষয়ে একটা মেসেজ। যে মানুষ খুব লজিক্যাল, তার কাছে আমরা পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাব— কত স্কুল হয়েছে, কত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। আর যে ইমোশনাল, তার কাছে দেখাব একটা গরিব মেয়ে কীভাবে সরকারি স্কলারশিপ পেয়ে ডাক্তার হলো।”

“আরেকটা এক্সাম্পল দিই,” ব্রায়ান বলল। “ধরুন দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলব। যে মানুষ খুব অর্গানাইজড, তার কাছে স্টেপ বাই স্টেপ প্ল্যান দেখাব— কীভাবে দারিদ্র্য কমছে। আর যে স্পন্টেনিয়াস, তার কাছে রিয়েল লাইফ স্টোরি। একটা গরিব পরিবার কীভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াল এই সরকারের সাহায্যে।”

মন্ত্রী মাথা নাড়লেন। “দারুণ! আর?”

“আছে স্যার। যারা নতুন জিনিস ট্রাই করতে পছন্দ করে, তাদের কাছে আমরা নতুন নতুন প্রজেক্টের কথা বলি। আর যারা ট্র্যাডিশনাল, তাদের কাছে বলি কীভাবে পুরোনো মূল্যবোধ রক্ষা করা হচ্ছে।”

হামিদ যোগ করল, “আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো স্যার, আমরা ছবি-ভিডিওও কাস্টমাইজ করি। যে মানুষ খুব ডিটেইল-ওরিয়েন্টেড, তার জন্য ইনফোগ্রাফিক। যে ক্রিয়েটিভ, তার জন্য আর্টিস্টিক ভিজ্যুয়াল।”

ব্রায়ানের গলায় একটা কাঁপুনি। “এভাবে আমরা প্রতিটা মানুষের মনের দরজায় সঠিক চাবি দিয়ে নক করি। তারা বুঝতেই পারে না কীভাবে তাদের মন বদলে যাচ্ছে। এই সরকারকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারবে না কেউ।”

মন্ত্রী চেয়ারে হেলান দিলেন। তার চোখে মুখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি। “এভাবে তো আমরা...”

“হ্যাঁ, স্যার,” হামিদ বলল, “এভাবে আমরা প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে পৌঁছে যেতে পারব। তাদের চিন্তা, আবেগ, স্বপ্ন— সবকিছু জানা যাবে। আর সেই অনুযায়ী তাদের ভোটিং সিস্টেমে প্রভাবিত করা যাবে।”

মন্ত্রী এবার উত্তেজিত। “এ তো অসাধারণ! কিন্তু এত তথ্য, এত বড় সিস্টেম— এটা কি নিরাপদ?”

ব্রায়ান গর্বের সাথে বলল, “আমরা কোয়ান্টাম এনক্রিপশন ব্যবহার করি, স্যার। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ সিস্টেম আমাদের।”

মন্ত্রী এবার ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। “কিন্তু এটা কি নৈতিক? মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য এভাবে ব্যবহার করা...”

ব্রায়ান একটু হাসল। “স্যার, এটা নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, এটা অগ্রগতির প্রশ্ন। যারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, তারাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে।”

মন্ত্রী থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে এখন শুধু উত্তেজনা। “ঠিক আছে। আমাদের দুটো এলাকায় এটার টেস্ট কেস দেখান। তারপর না হয় আমরা সিদ্ধান্ত নেব।”

হামিদ তার কথা শেষ করল, “হ্যাঁ স্যার, এভাবে আমরা পুরো জনগোষ্ঠীর মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। তারা কী ভাববে, কী করবে, কাকে ভোট দেবে— সব কিছু। আমরা ঠিক করে দেবো আগে থেকে।”

ঠিক তখনই ব্রায়ানের মনে হলো— এটাই কি গণতন্ত্রের শেষ পরিণতি? এআই-এর হাতে কি তুলে দেওয়া হচ্ছে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা? মনে কিছুটা বিষণ্নতায় ভরে গেল।

এখানে "এআই" একটা টুল, তবে এর পেছনের মানুষ এটাকে কীভাবে ব্যবহার করছে সেটাই সমস্যা। আবার এই "এআই" ভালো কাজে ব্যবহার করতে না দিলে খারাপ কাজে ব্যবহার বাড়বে। তারা ক্ষমতাটাকে একটা দেশকে দিচ্ছে, এখন সেই দেশটা এই ক্ষমতাকে নিয়ে কি করবে সেটা কি তাদের বিবেচনার মধ্যে পড়বে?

ব্রায়ান জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দূরে দেখা যাচ্ছে ঢাকার আকাশচুম্বী ভবনগুলো। প্রতিটি ভবনে হাজার হাজার কম্পিউটার, মোবাইল। প্রতিটিতে চলছে ডেটার অদৃশ্য প্রবাহ। ব্রায়ান ভাবল, সেই প্রবাহের মধ্যেই কি লুকিয়ে আছে মানবতার ভবিষ্যৎ? প্রযুক্তির এই অদৃশ্য হাত কি নির্ধারণ করবে আগামী দিনের পৃথিবী? মানুষের কী হবে?

সেপ্টেম্বর ২০১০

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল রাশাদ। ঢাকার রাস্তায় পানি জমে গেছে, লোকজন ছাতা মাথায় ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ দরজায় নক হলো। মনে হচ্ছে শাহরিয়ার এসেছে কফি নিয়ে। এই বর্ষাকালে ঢাকার এই ফ্ল্যাটে উঠেছে সে। রাশাদ ভাড়া নিয়ে দিয়েছে গত বছর।

"শাহরিয়ার? তুই কি এসেছিস?" রাশাদ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ", শাহরিয়ার ঘরে ঢুকল, হাতে দুটো কফির মগ। "এই নে," বলল সে, রাশাদের দিকে একটা মগ এগিয়ে দিয়ে। "তোর ফেভারিট কফি— ডাবল শট এসপ্রেসো, দুধ ছাড়া।"

রাশাদ মৃদু হেসে মগটা নিল। "থ্যাংকস। তুই কী নিলি?"

"আমি? ক্যারামেল ম্যাকিয়াতো, একটু বেশি মিষ্টি করে।" শাহরিয়ার হাসল।

রাশাদ ভুরু কুঁচকে তাকাল। "আবার? তোর ডায়াবেটিস হবে একদিন।"

শাহরিয়ার কাঁধ ঝাঁকাল। "লাইফটা ছোট, ভাই। মিষ্টিটা এনজয় কর।"

রাশাদ মাথা নাড়ল। "এই যে তুই মিষ্টি কফি খাস, এটা থেকেই বোঝা যায় তুই কত সহজে ইমোশনাল হয়ে যাস।"

সেই অনুযায়ী মেসেজ তৈরি করে, যা ডাইরেক্টলি মানুষের সাইকোলজিক্যাল মোটিভেশনকে টার্গেট করে।”

শাহরিয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, “তার মানে মানুষকে বছর ধরে ম্যানিপুলেট করা যায়?”

রাশাদ একটু ভেবে বলল, “একরকম তাই। তবে এটা সব সময় নেগেটিভ না। এই টেকনিকটা মার্কেটিংয়ে, হেলথকেয়ার কমিউনিকেশনে, এমনকি মানুষকে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতেও ইউজ করা যায়।”

শাহরিয়ার একটু ভেবে বলল, “আচ্ছা। তার মানে আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো এই নলেজটাকে এথিক্যাল ওয়েতে ইউজ করা?”

রাশাদ এনার্জেটিক হয়ে উঠল। “একজ্যাক্টলি! আমরা এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারি, যা মানুষকে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রসেস সম্পর্কে শিক্ষা দেবে, ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করবে না।”

শাহরিয়ার মাথা নাড়ল। “আমরা রেগুলার সার্ভে করতে পারি। দেখব কীভাবে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্যাটার্ন, পলিটিক্যাল প্রেফারেন্স, কনজিউমার হ্যাবিট চেইঞ্জ হচ্ছে।”

রাশাদ বলল, “সেটার একটা আউটলাইন পাচ্ছি স্ট্যানফোর্ডের দুই সাইকোলজির প্রফেসরের কাছ থেকে।”

শাহরিয়ার একমত হলো। “অবশ্যই। আমাদের লক্ষ্য হবে মানুষকে এমপাওয়ার করা, কন্ট্রোল করা নয়।”

রাশাদ জানালার দিকে তাকাল। ঢাকার আকাশে এখন রোদ উঠেছে। “আমার মনে হয় আমরা কিছু স্পেশাল শুরু করতে যাচ্ছি, শাহরিয়ার।”

শাহরিয়ার হাসল। “হ্যাঁ। এটা চ্যালেঞ্জিং হবে, কিন্তু এটা সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে।”

আজকের দিন

দুপুরের রোদ্দুর একটু হেলে পড়েছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কন্ট্রোল রুমে বসে আছেন এসপি রহমান। একমনে কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখ বোলাচ্ছেন। হঠাৎ করেই একটা ‘পিং’— নতুন ই-মেইল।

রহমান সাহেব হাই তুলে মাউস ক্লিক করলেন। গতকাল রাতে ঘুম হয়নি তার। বাচ্চাটার জ্বর কয়েকদিন ধরে। ই-মেইলটা খুলতেই তাঁর চোখ কপালে। সেন্ডার অজানা। কিন্তু মেসেজের কন্টেন্ট দেখে হতবাক তিনি। ১৪৩টা জায়গার জিও লোকেশন প্লটের একটা অ্যাটাচমেন্ট মেইলে। প্রতিটি লোকেশনে একটা করে মানুষ। যারা গত তিন দিন ধরে একদমই নড়েনি।

রহমান সাহেব চশমাটা খুলে চোখ কচলালেন। "এ কী ধরনের ডেটা? কে পাঠাল? কীভাবে জানল?" বিড়বিড় করলেন কতক্ষণ।

তাড়াতাড়ি ডিপার্টমেন্টের হেডকে ফোন করলেন। "স্যার, আপনি একটু আসবেন? একটা আর্জেন্ট ব্যাপার।"

পনেরো মিনিটের মধ্যেই পুরো হেডকোয়ার্টার হইহই। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ লোকেশনগুলো গুগল ম্যাপে প্লট করছে। কেউ ডেটা অ্যানালাইসিস করছে। প্লটিংয়ে ইউরোপের গ্যালিলিও জিপিএস সিস্টেম দেখাচ্ছে কীভাবে জানি।

রহমান সাহেব লক্ষ করলেন, বেশির ভাগ লোকেশন শহরের বিভিন্ন ফ্লাইওভারের নিচে। যেখানে প্রায়ই উদ্বাস্তু মানুষ থাকে। তবে কিছু লোকেশন রেসিডেনশিয়াল এরিয়ায়। এমনকি হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের ভেতরেও। নদী মানে নৌকার মধ্যেও ২ জন দেখাচ্ছে এখন।

রহমান সাহেব মাথা চুলকালেন, "এত অ্যাকুরেট ইনফরমেশন কীভাবে পেল এই লোক?"

বুঝলাম, মেনি লাইভস ক্যান বি সেভড। বাট, কোয়েশ্চেন রিমেইনড— হু সেন্ট দিস ইনফো? হোয়াই?

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল ফ্লোরে। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অস্বস্তিকর অবস্থা। টেকনিক্যাল টিমের মাসুদ এগিয়ে এলো। "স্যার, আমরা কিছু ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংস পেয়েছি। এই লোকেশন ডেটা অসাধারণ প্রিসাইজ।" মাসুদ সাধারণত কম কথা বলে। তার সিআইএতে একটা কোর্স করা আছে।

রহমান সাহেব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কতটা প্রিসাইজ?"

ও বলল, "স্যার, সাধারণ জিপিএস সিস্টেম প্রায় ১০ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত অ্যাকুরেট হয়। কিন্তু এই ডেটা দেখে মনে হচ্ছে এর অ্যাকুরেসি মিটার লেভেলে।"

এই সময় আরেকজন অফিসার যোগ দিলেন, “হ্যাঁ স্যার, এটা হাই-প্রিসিশন জিপিএস টেকনোলজি। মিলিটারি গ্রেড সিস্টেমে এই লেভেলের অ্যাকুরেসি পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই ম্যাপিং ডেটা ইন্টিগ্রেটেড এখানে।”

“মানে?”

মাসুদ মুখ খুলল। “বেসিক লেভেলে আমাদের পকেটে যেই মোবাইল আছে, সেটার সিগন্যাল স্ট্রেন্থ আমাদের লোকেশন বের করতে পারে। আমাদের ফোন যে তিনটা সেল টাওয়ারের সাথে যুক্ত, সেগুলোর সিগন্যালের স্ট্রেন্থ মেপে একটা ত্রিভুজ তৈরি করে তারা। এই ত্রিভুজের সেন্টার হলো আমাদের আনুমানিক অবস্থান। সেটা ১০০ মিটার পর্যন্ত যায়।”

“তাহলে এটা কীভাবে হলো?”

“হাই-প্রিসিশন লোকেশনে মোবাইলের বিভিন্ন সেন্সর মানে জাইরোস্কোপ, অ্যাক্সিলোমিটার দিয়ে অ্যালগরিদম ইউজ করে আরও ‘প্রিসাইজ’ করা যায়। এই অ্যালগরিদমগুলো এই সেন্সর ডেটা এবং সেল টাওয়ার, Wi-Fi এবং জিপিএস ডেটা অ্যানালাইজ করে আরও অ্যাকুরেট করতে পারে।”

রহমান সাহেব চিন্তিত হলেন, “তার মানে কি আমরা কোনো স্টেট-স্পনসর্ড অপারেশনের মুখোমুখি?”

আরেকজন টেক এক্সপার্ট মাথা নাড়লেন, “নট নেসেসারিলি, স্যার। আজকাল কমার্শিয়াল সেক্টরেও RTK (রিয়েল-টাইম কাইনেমেটিক) জিপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। ধারণা করছি সেগুলো সেন্টিমিটার-লেভেল অ্যাকুরেসি দিতে পারে। তবুও চেক করে বলছি আপনাকে।”

মাসুদ যোগ করল, “প্লাস, এই ডেটা শুধু জিপিএস থেকে আসেনি। মোবাইল নেটওয়ার্ক, ওয়াইফাই সিগন্যাল, এমনকি নিয়ারবাই ব্লুটুথ ডিভাইসের ডেটাও ইউজ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।”

সবাই চুপ হয়ে গেল।

রহমান সাহেব বিস্মিত হলেন, “এত সব ডেটা একসাথে প্রসেস করে এত নির্ভুল তথ্য বের করা... এটা তো কোনো সাধারণ হ্যাকারের কাজ না!”

মাসুদ একটু ইতস্তত করে বলল, “স্যার, আসলে... এই ধরনের কমপ্লেক্স ডেটা অ্যানালাইসিস আর প্রেডিকশন... এটা এআই ছাড়া সম্ভব না।”

রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “কিন্তু ইনডোর পিপলদের কীভাবে?”

টেকনিক্যাল অফিসার বললেন, “স্যার, সেটা আরও মাইন্ড-ব্লোয়িং। বর্তমানে, একটা নিউ টেক এসেছে— নিউরাল নেটওয়ার্ক ওয়াইফাই সিগন্যাল অ্যানালাইজ করে ‘ইট ক্যান সি থ্রু ওয়ালস’। ওয়াইফাই সিগন্যালের ‘সাটল’ চেঞ্জ অ্যানালাইজ করে ইনডোর পিপল, মানে দেয়ালের ওই পাশের মানুষের পজিশন আর মুভমেন্ট বোঝা যায়।”

রহমান সাহেব চিন্তায় পড়লেন। “এর মানে, কেউ আমাদের সবার মুভমেন্ট সিক্রেটলি মনিটর করছে? এটা তো টেরিফাইং!”

“কিন্তু এখন সেটা নিয়ে ওয়ারি করার টাইম নেই। অনেক পিপলের লাইফ অ্যাট রিস্ক। আর, আমরা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে নোটিফাই করতে পারি।”

রহমান সাহেব এডিশনাল ডিআইজি হুমায়ুনের সাথে আলাপ করেই আইজিপিকে জানালেন। একটা স্যাম্পল চেক করতে বললেন কাছের থানা থেকে। রেজাল্ট পজিটিভ। মানুষ পাওয়া গেল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর।

তিনি দ্রুতই অর্ডার দিলেন। “সব ইউনিটকে ইনফর্ম করো। ASAP এই লোকেশনগুলোয় পৌঁছাতে হবে। স্পেশালি ফ্লাইওভারের নিচের স্পটগুলোতে। ওখানে ‘হোমলেস’ মানুষজন থাকে। ওদের রেসকিউ করে হসপিটালে নিতে হবে।”

মাসুদ ফিরে এলো। “স্যার, আরেকটা জিনিস। ইমেইলের পেছনে দুটো ‘অ্যানোমাইজার’ সার্ভিস পেয়েছি। এরপরে আর ট্রেস করে পাচ্ছি না। মাল্টিপল সার্ভিস প্রোভাইডার ইনভলভড এখানে।”

এদিকে পুলিশের বেশ কয়েকটা ইউনিট দ্রুতই অ্যাকশনে নামল। বড় স্ক্রিনে প্রথম ডটটা এলো ৫৫ মিনিটের মাথায়। আস্তে আস্তে আপডেট আসতে শুরু করল।

“স্যার, গুলশান ফ্লাইওভারের নিচে থেকে দুইজনকে রেসকিউ করা হয়েছে। বোথ ওয়ার আনকনশাস।”

“মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডের সাইডে একজন এল্ডারলি পার্সনকে পেয়েছি আমরা। উনি নিয়ারলি দুই দিন কিছুই খাননি।”

“স্যার, বনানীর একটা অ্যাপার্টমেন্টে একজন একা বাসায় থাকতেন। উনার স্ট্রোক হয়েছিল। হসপিটালে পাঠানোর জন্য কল করেছি আমরা।”

এভাবে একে একে বিভিন্ন লোকেশন থেকে অনেক মানুষ উদ্ধার হতে থাকল। কেউ অসুস্থ, কেউ অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলেন, কেউবা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড।

রাত বাড়তে থাকল। পুলিশের এই অপারেশনের মধ্যে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স যোগ হলো। রহমান সাহেব থেকে গেলেন অফিসেই। ভোর ৪টার দিকে ফাইনাল রিপোর্ট এলো।

“স্যার, অল লোকেশনস চেকড। টোটাল ১৩৬ পিপল রেসকিউড। টু ফাউন্ড ডেড। দুইজনকে পাওয়া গেছে নৌকায়। রিমেইনিং ফাইভ স্পটস ওয়ার এম্পটি।”

জানুয়ারি ২০১১

ভিয়া অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সামনে বিস্তীর্ণ বরফঢাকা প্রান্তর, যেন অফুরন্ত সাদা কার্পেট বিছানো। দূরে পাহাড়ের সারি, হিমবাহের নীল আভা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আকাশ এত নীল যে মনে হয় হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যাবে।

হঠাৎ একঝাঁক আর্কটিক পাখি উড়ে গেল। তাদের ডানার শব্দে যেন নীরবতা ভেঙে গেল। বরফের ওপর সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে, মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ হীরের টুকরো ছড়িয়ে আছে।

দূরে একটা পোলার বিয়ার দেখা গেল। সাদা বরফের ওপর তার হলুদাভ সাদা গায়ের রং মিশে গিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পেছনে একটা ছোট্ট বাচ্চা, মায়ের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাঁটছে।

বরফঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে একটা ড্রোন উড়ে যাচ্ছে। ওর ছোট্ট মোটরের আওয়াজটা এই বিশাল নীরবতার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত সুর তুলছে।

হঠাৎ বাতাসে একটা পরিবর্তন এলো। তুষারকণা উড়তে শুরু করল, যেন কেউ আকাশ থেকে রুপালি ধুলো ছড়াচ্ছে। সূর্যের আলোয় সেগুলো ঝিকমিক করতে লাগল, চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে।